ঔপনিষদ ব্রহ্ম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

শ্রাবণ, ১৩০৮ সাল।

মূল্য।০ চারি আনা।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম।

ওঁ নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, এবং অদ্যকার সভায় সমাগত আর্য্যমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করি—ব্রহ্মবাদী ঋষিরা যে, ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে কি একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে? অদ্য আমরা কি তাঁহাদের সহিত সমস্ত যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি? বৃক্ষ হইতে যে জীর্ণ পল্লবটি ঝরিয়া পড়ে সেও বৃক্ষের মজ্জার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া যায়—সূর্য্যকিরণ হইতে যে তেজটুকু সে সংগ্রহ করে তাহা বৃক্ষের মধ্যে এমন করিয়া নিহিত করিয়া যায় যে মৃত কাষ্ঠও তাহা ধারণ করিয়া রাখে, আর আমাদের ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ ব্রহ্ম-সূর্য্যলোক হইতে যে পরম তেজ, যে মহান্ সত্য আহরণ করিয়াছিলেন তাহা কি এই নানা শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন বনস্পতির—এই ভারতব্যাপী পুরাতন আর্য্যজাতির মজ্জার মধ্যে সঞ্চিত করিয়া যান নাই?

তবে কেন আমরা গৃহে গৃহে আচারে অনুষ্ঠানে কায় মনে বাক্যে তাঁহাদের মহাবাক্যকে প্রতি মুহূর্ত্তে পরিহাস

করিতেছি? তবে কেন আমরা বলিতেছি, নিরাকার ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের গম্য নহেন, আমাদের ভক্তির আয়ত্ত নহেন, আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য নহেন? ঋষিরা কি এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কি প্রত্যক্ষ এবং তাঁহাদের উপদেশ কি সুস্পষ্ট নহে? তাঁহারা বলিতেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীদথ সত্যমস্তি,
নচেৎ ইহাবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ;

এখানে যদি তাঁহাকে জানা যায় তবেই জন্ম সত্য হয়, যদি না জানা যায় তবে মহতী বিনষ্টিঃ, মহা বিনাশ। অতএব ব্রহ্মকে না জানিলেই নয়। কিন্তু কে জানিয়াছে? কাহার কথায় আমরা আশ্বাস পাইব? ঋষি বলিতেছেন—

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তৎ বয়ং—
নচেৎ অবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ।

এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে আমরা জানিয়াছি, যদি না জানিতাম তবে আমাদের মহতী বিনষ্টি হইত। আমরা কি সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিব?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ সবিনয়ে বলেন—আমরা অবিশ্বাস করি না—কিন্তু ঋষিদের সহিত আমাদের অনেক প্রভেদ; তাঁহারা যেখানে আনন্দে বিচরণ করিতেন আমরা সেখানে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি না। সেই প্রাচীন মহারণ্যবাসী বৃদ্ধ পিপ্পলাদ ঋষি এবং

সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈবশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্য্যায়নী চ গার্গ্যঃ, কৌশল্যাশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ—সেই ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যপুত্র গার্গ্য, অশ্বলপুত্র কৌশল্য, ভৃগুপুত্র বৈদর্ভি, কাত্যায়নপুত্র কবন্ধী, সেই ব্রহ্মপর ব্রহ্মনিষ্ঠ পরংব্রহ্মান্বেষমাণ ঋষিপুত্রগণ, যাঁহারা সমিৎ হস্তে বনস্পতিচ্ছায়াতলে গুরুসম্মুখে সমাসীন হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতেন তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা হয় না।

না হইতে পারে, ঋষিদের সহিত আমাদের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য এক, ধর্ম্ম এক, ব্রহ্ম এক;—যাহাতে ঋষিজীবনের সার্থকতা, আমাদের জীবনের সার্থকতাও তাহাতেই; যাহাতে তাঁহাদের মহতী বিনষ্টি তাহাতে আমাদের পরিত্রাণ নাই। শক্তি এবং নিষ্ঠার তারতম্য অনুসারে সত্যে ধর্ম্মে এবং ব্রহ্মে আমাদের ন্যূনাধিক অধিকার হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া অসত্য অধর্ম্ম অব্রহ্ম আমাদের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। ঋষিদের সহিত আমাদের ক্ষমতার প্রভেদ আছে বলিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত পথের বিপরীত পথে গিয়া আমরা সমান ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি তাঁহাদের এই কথা বিশ্বাস কর যে, ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, এখানে তাঁহাকে জানিলেই জীবন সার্থক হয়—নচেৎ মহতী বিনষ্টিঃ, তবে বিনয়ের সহিত

শ্রদ্ধার সহিত মহাজনপ্রদর্শিত সেই সত্যপথই অবলম্বন করিতে হইবে।

সত্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেরই পক্ষে এক মাত্র এবং ঋষির মুক্তিবিধানের জন্য যিনি ছিলেন আমাদের মুক্তিবিধানের জন্যও সেই একমেব অদ্বিতীয়ং তিনি আছেন। যাঁহার পিপাসা অধিক তাঁহার জন্যও নির্ম্মল নির্ঝরিণী অভ্রভেদী অগম্য গিরিশিখব হইতে অহোরাত্র নিঃস্যন্দিত, আর যাঁহার অল্পপিপাসা এক অঞ্জলি জলেই পরিতৃপ্ত তাঁহার জন্যও সেই অক্ষয় জলধারা অবিশ্রাম বহমানা,—হে পান্থ, হে গৃহী, যাহার যতটুকু ঘট, লইয়া আইস, যাহার যতটুকু পিপাসা, পান করিয়া যাও!

আমাদের দৃষ্টিশক্তির প্রসর সঙ্কীর্ণ তথাপি সমুদয় সৌর জগতেব একমাত্র উদ্দীপনকারী সূর্য্যই কি আমাদিগকে আলোক বিতরণের জন্য নাই? অবরুদ্ধ অন্ধকূপই আমাদের মত ক্ষুদ্রকায়ার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে তবু কি অনন্ত আকাশ হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি? পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র একাংশ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলেই আমাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, তবু কেন মনুষ্য চন্দ্রসূর্য্যগ্রহ-তারার অপরিমেয় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অশ্রান্ত কৌতূহলে নিবন্তর লোকলোকান্তরে আপন গবেষণা প্রেরণ করিতেছে? আমরা যতই ক্ষুদ্র হই-না কেন তথাপি ভূমৈব সুখং ভূমাই আমাদের সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমাদের সুখ নাই।

হঠাৎ মনে হইতে পারে ব্রহ্ম হইতে অনেক অল্পে, পরিমিত আকারবদ্ধ আয়ত্তগম্য পদার্থে আমাদের মত স্বল্পশক্তি জীবের সুখে চলিয়া যাইতে পারে—কিন্তু তাহা চলে না। ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং—যিনি উত্তরতর অর্থাৎ সকলের অতীত, যাঁহাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, যিনি অশরীর, রোগশোক-রহিত—য এতদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি যাঁহারা ইহাকেই জানেন তাঁহারাই অমর হন—অথ ইতরে দুঃখমেব অপিয়ন্তি, আর সকলে কেবল দুঃখই লাভ করেন।

উপনিষৎ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।

তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ কর!

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং—

উপনিষদে যে মহাস্ত্র ধনুর কথা আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া—

শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত—

উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে!

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি!

তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য-স্বরূপ সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর!

এই উপমাটি অতি সরল। যখন শুভ্র সবলতনু আর্য্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন,

যখন হিংস্র পশু এবং হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে তখনকার সেই টঙ্কারমুখর অরণ্যনিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা!

এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে। ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে - ইহার মধ্যে লেশমাত্র কুণ্ঠিত ভাব নাই। প্রকৃতির একান্ত সারল্য এবং ভাবের একাগ্র বেগ না থাকিলে এমন অসঙ্কোচ বাক্য কাহারো মুখ দিয়া বাহির হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই এরূপ সাহসিক উপমা এমন সহজ এমন প্রবল সরলতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন। মৃগ যেমন ব্যাধের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য, ব্রহ্ম তেমনি আত্মার অনন্য লক্ষ্যস্থল। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। প্রমাদ-শূন্য হইয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইবে।

উপমাটি যেমন সরল, উপমার বিষয়গত কথাটি তেমনি গভীর। এখন সে অরণ্য নাই, সে ধনুঃশর নাই; এখন নিরাপদ নগরনগরী অপরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত। কিন্তু সেই আরণ্যক ঋষিকবি যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন সেই সত্য অদ্যকার সভ্য যুগের পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান বন্দুকে, ধনুঃশরকে জিতিয়াছে কিন্তু সেই কত শত

শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সমস্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে তদেতৎ সত্যং সেই যে একমাত্র সত্য, যদ্ অণুভ্যোণুচ, যাহা অণু হইতেও অণু, অথচ যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ, যাহাতে লোক সকল এবং লোকবাসী সকল নিহিত রহিয়াছে সেই অপ্রত্যক্ষ ধ্রুব সত্যকে শিশুতুল্য সরল ঋষিগণ অতি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। তদমৃতং, তাহাকেই তাঁহারা অমৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং শিষ্যকে ডাকিয়া বলিয়াছেন তদ্ভাবগতেন চেতসা, তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য কর—তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য তাঁহাকে বিদ্ধ কর! শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ, লক্ষ্যপ্রবিষ্ট শরের ন্যায় তাঁহারই মধ্যে তন্ময় হইয়া যাও!

সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের অতীত সেই পরম সত্যকে কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা বিচার করা সেও সামান্য কথা নহে, শুদ্ধ যদি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তাহাতেও সেই স্বল্পাশী বিরলবসন সরলপ্রকৃতি বনবাসী প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের বুদ্ধিশক্তির মহৎ উৎকর্ষ প্রকাশ পাইত।

কিন্তু উপনিষদের এই ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা নহে—সকল সত্যকে অতিক্রম করিয়া ঋষি যাঁহাকে একমাত্র তদেতৎ সত্যং বলিয়াছেন, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞদের পক্ষে তিনি কেবল জ্ঞানলভ্য একটি দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলেন না—একাগ্রচিত্ত ব্যাধের ধনু হইতে শর যেরূপ প্রবলবেগে

প্রত্যক্ষ সন্ধানে লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, ব্রহ্মর্ষিদের আত্মা সেই পরম সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইবার জন্য সেইরূপ আবেগের সহিত ধাবিত হইত। কেবল মাত্র সত্য নিরূপণ নহে, সেই সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

কারণ, সেই সত্য কেবলমাত্র সত্য নহে, তাহা অমৃত। তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া নাই, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আত্মার অমরত্ব। এই জন্য সেই অমৃত পুরুষ ছাড়িয়া আমাদের আত্মার অন্য গতি নাই ঋষিরা ইহা প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

স যঃ অন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ—

অর্থাৎ যিনি পরমাত্মা ব্যতীত অন্যকে আপনার প্রিয় করিয়া বলেন—প্রিয়ং রোৎস্যতীতি—তাঁহার প্রিয় বিনাশ পাইবে! যে সত্য আমাদের জ্ঞানের পক্ষে সকল সত্যের শ্রেষ্ঠ আমাদের আত্মার পক্ষে তাহাই সকল প্রিয়ের প্রিয়তম;—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়োবিত্তাৎ, প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—

এই যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর পরমাত্মা ইনি আমাদের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। তিনি শুষ্ক জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের আত্মার প্রিয়তম।

আধুনিক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া কোন ধর্ম্ম সংস্থাপন হইতে পারে না, তাহা কেবল তত্বজ্ঞানীদের অবলম্বনীয়, তাঁহারা উক্ত ঋষিবাক্য স্মরণ করিবেন। ইহা কেবল বাক্যমাত্র নহে,—প্রীতিরসকে অতি নিবিড় নিগূঢ় রূপে আস্বাদন করিতে না পারিলে এমন উদার উন্মুক্ত ভাবে এমন সরল সবল কণ্ঠে প্রিয়ের প্রিয়ত্ব ঘোষণা করা যায় না।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—

ব্রহ্মর্ষি এ কথা কোন ব্যক্তিবিশেষে বদ্ধ করিয়া বলিতেছেন না—তিনি বলিতেছেন না, যে, তিনি আমার নিকট আমার পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়—তিনি বলিতেছেন আত্মার নিকটে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর—জীবাত্মামাত্রেরই নিকট তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়—জীবাত্মা যখনই তাঁহাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে তখনি বুঝিতে পারে তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই।

অতএব পরমাত্মাকে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জানিব তদেতৎ সত্যং, তাহা নহে, তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিব তদমৃতং। তাঁহাকে সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া জানিব, এবং সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রীতি করিব। জ্ঞান ও প্রেম সমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই

ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনা—তত্ত্বাবগতেন চেতসা এই সাধনা করিতে হইবে; ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম।

উপনিষদের ঋষি যে জীবাত্মামাত্রেরই নিকট পরমাত্মাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিজনক বলিতেছেন তাহার অর্থ কি? যদি তাহাই হইবে তবে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাম্যমান হই কেন? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি যখন বলেন কাব্যরসাবতারণায় বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ কবি—তখন একথা বুঝিলে চলিবে না যে কেবল তাঁহারই নিকট বাল্মীকির কাব্যরস সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়। তিনি বলেন সকল পাঠকের পক্ষেই এই কাব্যরস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই মনুষ্য-প্রকৃতি। কিন্তু কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য জানপদ বাল্মীকির কাব্য অপেক্ষা যদি স্থানীয় কোন পাঁচালি গানে অধিক সুখ অনুভব করে তবে তাহার কারণ তাহার অজ্ঞতামাত্র। সে লোক অশিক্ষা বশতঃ বাল্মীকির কাব্য যে কি তাহা জানে না, এবং সেই কাব্যের রস যেখানে, অনভিজ্ঞতা বশতঃ সেখানে সে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না—কিন্তু তাহার অশিক্ষাবাধা দূর করিয়া দিবামাত্র যখনি সে বাল্মীকির কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবে তখনি সে স্বভাবতই মানবপ্রকৃতির নিজগুণেই গ্রাম্য পাঁচালি অপেক্ষা বাল্মীকির কাব্যকে রমণীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। তেমনি যে ঋষি ব্রহ্মের অমৃতরস আস্বাদন করিয়াছেন, যিনি

তাঁহাকে পৃথিবীর অন্য সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি ইহা সহজেই বুঝিয়াছেন যে ব্রহ্ম স্বভাবতই আত্মার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিদায়ক—ব্রহ্মের প্রকৃত পরিচয় পাইবামাত্র আত্মা স্বভাবতই তাঁহাকে পুত্র, বিত্ত ও অন্য সকল হইতেই প্রিয়তম বলিয়া বরণ করে।

ব্রহ্মের সহিত এই পরিচয় যে কেবল আত্মার আনন্দ সাধনের জন্য তাহা নহে, সংসারযাত্রার পক্ষেও তাহা না হইলে নয়। ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি বৃহৎ বলিয়া না জানিয়া সংসারকেই বৃহৎ বলিয়া জানে সংসারযাত্রা সে সহজে নির্ব্বাহ করিতে পারে না,—সংসার তাহাকে রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া নিজের জঠরানলে দগ্ধ করিতে থাকে।

এই জন্য ঈশোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা কিছু আচ্ছন্ন জানিবে এবং—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং

তাঁহার দ্বারা যাহা দত্ত, যাহা কিছু তিনি দিতেছেন তাহাই ভোগ করিবে পরের ধনে লোভ করিবে না।

সংসারযাত্রার এই মন্ত্র। ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দর্শন করিবে, ঈশ্বরের দত্ত আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করিবে, লোভের দ্বারা পরকে পীড়িত করিবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে

সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে। সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে—সেই ভোগে সে ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করে না—নিজের ভোগমত্ততায় পরকে পীড়া দেয় না। সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া জানি তবে সংসারসুখের জন্য আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে। এই জন্য সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে—কারণ সংসারকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রহ্মের দান বলিয়া জানিলে তবেই কল্যাণের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সম্ভব হয়।

পরের শ্লোকে বলিতেছেনঃ—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।

কর্ম্ম করিয়া শত বৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে,—হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই, কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হইবে না—কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ইহাই স্মরণ করিয়া কর্ম্মের দ্বারা জীবনের শতবর্ষ যাপন করিবে।

ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন অনুভব করিয়া ভোগ করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন অনুভব করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততোভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারকর্ম্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে—তদপেক্ষা ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্ম্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মের উপাসনা করিবে না, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে।

কিন্তু বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্ম্ম নির্ব্বাহও ভাল তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কেবল মাত্র আত্মার আনন্দ সাধনের জন্য ব্রহ্মসম্ভোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্ম্ম সাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা সংসারের তাৎপর্য্যই তাই। মঙ্গলকর্ম্ম সাধনেই আমাদের স্বার্থ প্রবৃত্তি সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ আমাদের হৃদগত বন্ধন সকলের মোচন হইয়া থাকে—আমাদের যে রিপু সকল মৃত্যুর মধ্যে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখে সেই মৃত্যুপাশ অবিশ্রাম মঙ্গল কর্ম্মের সংঘর্ষেই ছিন্ন হইয়া যায়। কর্ত্তব্য কর্ম্মের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মুক্তির সাধনা,—এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে—ইহার আর অন্যথা নাই—কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলাভের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

ইহাই সংসারধর্ম্মের মূলমন্ত্র—কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম, জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন। কর্ম্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকিব, ব্রহ্ম সেই মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন। নহিলে কিসের জন্য আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাম পাইয়াছি, কেন এই পেশী, এই স্নায়ু, এই বাহুবল, এই বুদ্ধিবৃত্তি, কেন এই স্নেহপ্রেম দয়া, কেন এই বিচিত্র সংসার? ইহার কি কোন অর্থ নাই? ইহা কি

সমস্তই অনর্থের হেতু? ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া উঠে এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাঁহাকে একাকী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট হই।

পিতা আমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন, সেখানকার নিয়ম এবং কর্ত্তব্য সর্ব্বথা সুখজনক নহে। সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বালক পিতৃ-গৃহে পালাইয়া আনন্দলাভ করিতে চায়। সে বোঝে না বিদ্যালয়ে তাহার কি প্রয়োজন—সেখান হইতে পলায়নকেই সে মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, কারণ পলায়নে আনন্দ আছে। মনোযোগের সহিত বিদ্যা সম্পন্ন করিয়া বিদ্যালয় হইতে মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহা সে জানে না। কিন্তু সুছাত্র প্রথমে পিতার স্নেহ সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার দুঃখকে গণ্য করে না, পরে বিদ্যাশিক্ষায় অগ্রসর হইবার আনন্দে সে তৃপ্ত হয়—অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়া মুক্তিলাভের আনন্দে সে ধন্য হইয়া থাকে।

যিনি আমাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন সংসার-বিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে যেন সন্দেহ না করি—এখানকার দুঃখকাঠিন্য বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া এখানকার কর্ত্তব্য একান্তচিত্তে পালন করিয়া পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে ব্রহ্মামৃত লাভের সার্থকতা যেন অনুভব করি। ঈশ্বরকে

সর্ব্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি তাহাই মুক্তি। সংসারকে অপমান পূর্ব্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিড়ম্বনা—তাহা একজাতীয় স্বার্থপরতা।

সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। কারণ সংসারের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থ সাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। সংসারে পরের দিকে একেবারে না তাকাইলে নিজের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। নৌকা যেমন গুণ দিয়া টানে তেমনি সংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্ব্বদাই প্রতিকূল স্রোত বাহিয়া নিজের দিক হইতে পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের স্বার্থ ক্রমশই আমাদের সন্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, প্রতিবেশীর স্বার্থ, স্বদেশের স্বার্থ এবং সর্ব্বজনের স্বার্থে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

কিন্তু যাঁহারা সংসারের দুঃখ শোক দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নিমগ্ন হন তাঁহাদের স্বার্থপরতা সর্ব্বপ্রকার আঘাত হইতে সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

বৃক্ষে যে ফল থাকে সে ফল বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পরিপক্ক হইয়া উঠে। যতই সে পরিপক্ক হইতে থাকে ততই বৃক্ষের সহিত তাহার বৃন্তবন্ধন শিথিল হইয়া আসে—

অবশেষে তাহার অভ্যন্তরস্থ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃন্ত হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজকে সার্থক করিয়া তোলে। আমরাও সংসারবৃক্ষ হইতে সেইরূপ বিচিত্র রস আকর্ষণ করি—মনে হইতে পারে তাহাতে সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইবে—কিন্তু তাহা নহে,—আত্মার যথার্থ পরিণতি হইলে বন্ধন আপনি শিথিল হইয়া আসে। ফলের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আত্মা সচেতন; রস নির্ব্বাচন ও আকর্ষণ বহুল পরিমাণে আমাদের স্বায়ত্ত। আত্মার পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচার পূর্ব্বক সংসার হইতে রস গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে পারিলেই সংসারের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং সেই সঙ্গে আত্মার সফলতা সম্পন্ন হইলে সংসারের কল্যাণবন্ধন সহজেই শিথিল হইয়া আসে। অতএব ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন জানিয়া সংসারকে তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, তাঁহার দত্ত সুখ সমৃদ্ধির দ্বারা ভোগ করিবে—সংসারকে শেষ পরিণাম বলিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে না। অপর পক্ষে সংসারের বৃন্তবন্ধন বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মঙ্গলরস হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করিবে না। ঈশ্বর এই সংসারবৃক্ষের সহস্র তন্তুর মধ্য দিয়া আমাদের আত্মায় কল্যাণরস প্রেরণ করেন; এই জীবধারয়িতা বিপুল বনস্পতি হইতে দম্ভভরে পৃথক হইয়া নিজের রস নিজে যোগাইবার ক্ষমতা আমাদের হস্তে নাই।

কোন সত্যকে অস্বীকার করিয়া আমাদের নিস্তার নাই।

মত্ততার বিহ্বলতায় মাতাল বিশ্বসংসারকে নগণ্য করিয়া যে অন্ধ আনন্দ উপভোগ করে সে আনন্দের শ্রেয়স্করতা নাই। বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সৎ এবং অসৎ, ব্রহ্ম এবং সংসার উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য কর্ত্তব্য বন্ধন ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারকে একেবারেই "না" করিয়া দিয়া একাকী আনন্দ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হওয়া একজাতীয় প্রমত্ততা। সত্যের একদিককে উপেক্ষা করিলে অপর দিকও অসত্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরের আদেশ পালনকে যে অস্বীকার করে, সে মুখে যাহাই বলুক ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। বরঞ্চ ঈশ্বরকে মুখে অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করে সে কঠিন কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাকে।

জ্ঞানে এবং ভোগে এবং কর্ম্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গীনভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই সংসার—আমাদের এই কর্ম্মক্ষেত্র; ইহাই আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির। এখানে জগৎমণ্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান, জগৎ সৌন্দর্য্যের ভোগে ঈশ্বরের ভোগ এবং জগৎসংসারের কর্ম্মে ঈশ্বরের কর্ম্ম জড়িত রহিয়াছে;—সংসারের সেই জ্ঞান সৌন্দর্য্য ও ক্রিয়াকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে অন্তরতর করিয়া জানা যায় এবং সংসারযাত্রাও কল্যাণকর হইয়া উঠে। তখন ত্যাগ এবং ভোগের সামঞ্জস্য

হয়, কাহারও ধনে লোভ থাকে না, অনর্থক বলিয়া জীবনের প্রতি উপেক্ষা জন্মে না, শতবর্ষ আয়ু যাপন করিলেও পরমাত্মার সার্থকতা উপলব্ধি হয়—এবং সেই অবস্থায়

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন, এবং সর্ব্ব ভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

গম্যস্থানের পক্ষে পথ যেমন একইকালে পরিহার্য্য এবং অবলম্বনীয় ব্রহ্মলাভের পক্ষে সংসার সেইরূপ। পথকে যেমন আমরা প্রতিপদে পরিত্যাগ করি এবং আশ্রয় করি সংসারও সেইরূপ আমাদের প্রতিপদে বর্জ্জনীয় এবং গ্রহণীয়। পথ নাই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া পথপ্রান্তে পড়িয়া স্বপ্ন দেখিলে গৃহ লাভ হয় না—এবং পথকেই শেষ লক্ষ্য বলিয়া বসিয়া থাকিলে গৃহে গমন ঘটে না। গম্যস্থানকে যে ভাল বাসে, পথকেও সে ভালবাসে; পথ গম্যস্থানেরই অঙ্গ, অংশ এবং আরম্ভ বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মকে যে চায়, ব্রহ্মের সংসারকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না—সংসারকে সে প্রীতি করে এবং সংসারের কর্ম্মকে ব্রহ্মের কর্ম্ম বলিয়াই জানে।

আর্য্যধর্ম্মের বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা বলিবেন সংসারের সহিত যদি ব্রহ্মের যোগ সাধন করিতে হয় তবে ব্রহ্মকে সংসারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। তাই যদি হইল তবে সত্যের প্রয়োজন কি?

সংসার ত আছেই—কাল্পনিক সৃষ্টির দ্বারা সেই সংসারেরই আয়তন বিস্তার করিয়া লাভ কি ? আমরা অসৎ সংসারে আছি বলিয়াই আমাদের সত্যের প্রয়োজন, আমরা সংসারী বলিয়াই সেই সংসারাতীত নির্ব্বিকার অক্ষর পুরুষের আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে—সে আদর্শ বিকৃত হইতে দিলেই তাহা সছিদ্র তরণীর ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেয় না। যদি সত্যকে, জ্যোতিকে, অমৃতকে আমরা অসৎ, অন্ধকার এবং মৃত্যুর পরিমাপে খর্ব্ব করিয়া আনি, তবে কাহাকে ডাকিয়া কহিব

অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যো র্মামৃতং গময় ?

সংসারী জীবের পক্ষে একটি মাত্র প্রার্থনা আছে—সে প্রার্থনা অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। সত্যকে মিথ্যা করিয়া লইয়া তাহার নিকট সত্যের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ চলে না, জ্যোতিকে স্বেচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার নিকট আলোকের জন্য প্রার্থনা বিড়ম্বনা মাত্র, অমৃতকে স্বহস্তে মৃত্যুধর্ম্মের দ্বারা বিকৃত করিয়া তাহার নিকট অমৃতের প্রত্যাশা মূঢ়তা। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—যে ব্রহ্ম সমস্ত জগতের সমস্ত পদার্থকে

আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন সংসারী সেই ব্রহ্মকেই সর্ব্বত্র অনুভব করিবেন উপনিষদের এই অনুশাসন।

দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি বলিবেন, উপদেশ সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহা পালন কঠিন। অরূপ ব্রহ্মের মধ্যে দুঃখ শোকের নির্ব্বাপন সহজ নহে। কিন্তু যদি সহজ না হয় তবে দুঃখ নির্ব্বাপনের, মুক্তি লাভের অন্য যে কোন উপায় আরও কঠিন—কঠিন কেন অসাধ্য। স্বতঃপ্রবাহিত অগাধ স্রোতস্বিনীর মধ্যে অবগাহন স্নান যদি কঠিন হয় তবে স্বহস্তে ক্ষুদ্রতম কূপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে অবতরণ আরও কত কঠিন—তাই বা কেন, নিজের ক্ষুদ্র কলস-পরিমিত জল নদী হইতে বহন করিয়া স্নান করা সেও দুরূহতর। যখন ব্রহ্মকে অরূপ অনন্ত অনির্ব্বচনীয় বলিয়া জানি তখনি তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন অতি সহজ হয়—তখনি তাঁহার দ্বারা পরিপূর্ণ রূপে পরিবৃত হইয়া আমাদের ভয় দুঃখ শোক সর্ব্বাংশে দূর হইয়া যায়। এই জন্যই উপনিষদে আছে—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন,—

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কাহা হইতেও ভয় পান না। অতএব ব্রহ্মের সেই বাক্যমনের অগোচর অনন্ত পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের ভয় দুঃখ নিঃশেষে নিরস্ত হয়। তাঁহাকে বিশ্বজগতের অন্যান্য

বস্তুর ন্যায় বাঙ্‌মনোগোচর ক্ষুদ্র করিয়া খণ্ড করিয়া দেখিলে আমরা সেই পরম অভয়, সেই ভূমা আনন্দ লাভ করিতে পারি না। আমরা ত সংসারের সঙ্কীর্ণতা-দ্বারা প্রতিহত, জটিলতা দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত, খণ্ডতা দ্বারা শতধা-বিক্ষিপ্ত হইয়া আছি,—আমরা জানি সংসারের "স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি," সংসারের সমুদয় স্রোত ভয়াবহ—সকলেরই মধ্যে ভয়দুঃখক্লেশ জরামৃত্যুবিচ্ছেদের কারণ রহিয়াছে;—অতএব আমরা যখন শান্তি চাই, অভয় চাই, আনন্দ চাই, অমৃত চাই তখন সহজেই স্বভাবতই কাহাকে চাই? যাঁহাকে পাইলে শান্তিমত্যন্তমেতি, অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। তিনি কে? উপনিষৎ বলেন স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ তিনি সংসার, কাল এবং আকৃতি অর্থাৎ সাকার পদার্থ হইতে পরঃ, শ্রেষ্ঠ, এবং অন্যঃ অর্থাৎ ভিন্ন। যদি তিনি সংসার, কাল, ও সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন না হইতেন তবে ত সংসারই আমাদের যথেষ্ট ছিল—তবে ত তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।

বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া অত্যন্ত শিব এবং অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। অতএব যাঁহারা বলেন আমরা সেই ভূমা স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারি না সেই জন্য তাঁহাতে আমাদের স্থিতি আমাদের শান্তি নাই তাঁহারা উপনিষৎকথিত পরম সত্য হইতে স্খলিত হইতেছেন—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো-বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না তাঁহাতেই আমাদের পরম আনন্দ, আমাদের অনন্ত অভয়। ঋষিরা কহিতেছেন,

যৎ বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে—

যিনি বাক্য দ্বারা উদিত নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা উদিত, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিং নেদং যদিদ মুপাসতে—

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে। যাঁহাকে বলা যায় না, যাঁহাকে ভাবা যায় না তাঁহাকেই জানিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নহে—যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হইত তবে তাঁহাকে জানিয়া আমাদের আনন্দামৃত লাভ হইত না। তাঁহাকে আমরা অন্তরাত্মার মধ্যে এতটুকু জানি যাহাতে বুঝিতে পারি তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না এবং তাহাতেই আমাদের আনন্দের শেষ থাকে না।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদচ,
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ—

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানি এমন আমি মনে করি না, না জানি যে তাহাও নহে, আমাদের মধ্যে যিনি তাঁহাকে জানেন তিনি ইহা জানেন যে, তাঁহাকে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে।

শিশু কি তাহার মাতার সম্যক্ পরিচয় জানে? কিন্তু সে অনুভবের দ্বারা এবং এক অপূর্ব্ব সংস্কার দ্বারা এটুকু ধ্রুব জানিয়াছে যে তাহার ক্ষুধার শান্তি, তাহার ভয়ের নিবৃত্তি, তাহার সমস্ত আরাম মাতার নিকট। সে তাহার মাতাকে জানে এবং জানেও না। মাতার অপর্য্যাপ্ত স্নেহ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার সাধ্য তাহার নাই, কিন্তু যতটুকুতে তাহার তৃপ্তি ও শান্তি ততটুকু সে আস্বাদন করে এবং আস্বাদন করিয়া ফুরাইতে পারে না। আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মকে এই জগতের মধ্যে এবং আপন অন্তরাত্মার মধ্যে কিছু জানিতে পারি এবং সেইটুকু জানাতেই ইহা জানি যে, তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না; জানি যে, তাঁহা হইতে বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, এবং মাতৃ-অঙ্ককামী শিশুর মত ইহাও জানিতে পারি যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন—তাঁহার আনন্দ যে পাইয়াছে তাহার আর কাহারও নিকট হইতে কদাচ কোন ভয় নাই।

যাঁহারা উপনিষৎ অবিশ্বাস করিয়া ঋষিবাক্য অমান্য

করিয়া ব্রহ্মলাভের সহজ উপায়স্বরূপ সাকার পদার্থকে অবলম্বন করেন তাঁহারা একথা বিচার করিয়া দেখেন না যে, ঐকান্তিক সহজ কঠিন বলিয়া কিছু নাই। সন্তরণ অপেক্ষা পদব্রজে চলা সহজ বলিয়া মানিয়া লইলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জলের উপর দিয়া পদব্রজে চলা সহজ নহে—সেখানে তদপেক্ষা সন্তরণ সহজ। অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে মনন দ্বারা জানা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ পদার্থকে চক্ষু দ্বারা দেখা সহজ একথা স্বীকার্য কিন্তু তাই বলিয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থকে চক্ষু দ্বারা দেখা সহজ নহ—এমন কি, তাহা অসাধ্য। তেমনি সাকার মূর্ত্তির রূপ ধারণা সহজ সন্দেহ নাই কিন্তু সাকার মূর্ত্তির সাহায্যে ব্রহ্মের ধারণা একেবারেই অসাধ্য, কারণ, স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ তিনি সংসার হইতে কাল হইতে সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন এবং সেই জন্যই তাঁহাতে সংসারাতীত দেশকালাতীত শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি অত্যন্ত মঙ্গল এবং অত্যন্ত শান্তিলাভ হয়; অথচ তাঁহাকে পুনশ্চ আকৃতির মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা এত কঠিন যে তাহা অসাধ্য, অসম্ভব, তাহা স্বতোবিরোধী।

কিন্তু সহজ কঠিনের কথা উঠে কেন? আমরা সহজ চাই, না সত্য চাই? সত্য যদি সহজ হয় ত ভাল, যদি না হয় তবু সত্য বই গতি নাই। পৃথিবী কূর্ম্মের পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত আছে এ কথা ধারণা করা যদি কাহারও পক্ষে সহজ হয়,

তথাপি বিজ্ঞান-পিপাসু সত্যের মুখ চাহিয়া তাহাকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মরু-প্রান্তরের মধ্যে ভ্রাম্যমান ক্ষুধার্ত্ত যখন অন্ন চায়, তখন তাহাকে বালুকাপিণ্ড আনিয়া দেওয়া সহজ—কিন্তু সে বলে আমি ত সহজ চাই না, আমি অন্নপিণ্ড চাই—সে অন্ন এখানে যদি না পাওয়া যায়, তবে দুরূহ হইলেও তাহাকে অন্যত্র হইতে আহরণ করিতে হইবে, নহিলে আমি বাঁচিব না। তেমনি সংসার মধ্যে আমরা যখন অধ্যাত্ম-পিপাসা মিটাইতে চাই তখন কল্পনা-মরীচিকায় সে কিছুতেই মিটে না—যত দুর্লভ হউক্ সেই পিপাসার জল—আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় পরমাত্মাকেই চাই—তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার বাক্যমনের অগোচর হইলেও তবু তাঁহাকেই চাই, নহিলে আমাদের মুক্তি নাই। ধর্ম্মপথ ত সহজ নহে, ব্রহ্মলাভ ত সহজ নহে, সে কথা সকলেই বলে—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—সেই জন্যই মোহনিদ্রাগ্রস্ত সংসারীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ঋষি উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"—না উঠিলে না জাগিলে এই ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম দুরত্যয় পথে চক্ষু মুদিয়া চলা যায় না, আত্মার অভাব আলস্যভরে অনায়াসে মোচন হয় না—এবং ব্রহ্ম ক্রীড়াচ্ছলে কল্পনাবাহিত মনোরথের গম্য নহেন। সংসারে যদি বিদ্যালাভ, বিত্তলাভ, যশোলাভ সহজ না হয়,—তবে ধর্ম্মলাভ, সত্যলাভ, ব্রহ্মলাভ সহজ, এমন আশ্বাস কে দিবে এবং সে আশ্বাসে কে ভুলিবে!

কোন্ মূঢ় বিশ্বাস করিবে যে, মন্ত্রোচ্চারণে লোহা সোনা হইয়া যাইবে, খনি অন্বেষণের প্রয়োজন নাই? উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি!

তবে ব্রহ্মলাভের চেষ্টা কি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে? তবে কি এই কথা বলিয়া মনকে বুঝাইতে হইবে যে, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাঁহাদের নিকট ভালমন্দ সুন্দর কুৎসিত অন্তর বাহিরের ভেদ একেবারে ঘুচিয়া গেছে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদেরই জন্য? তাই যদি হইবে তবে ব্রহ্মবাদী ঋষি ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে কেন অনুশাসন করিতেছেন প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ, সন্তানসূত্র ছেদন করিবে না, অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে। কেন শাস্ত্রকার বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ, গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন; এবং তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ, তত্ত্বজ্ঞানী হইবেন, অর্থাৎ যে নিষ্ঠার কথা কহিলেন তাহা যেন অজ্ঞান-নিষ্ঠা না হয়, গৃহী যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মে নিরত হইবেন, এবং যদ্‌যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন;—অতএব শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে, গৃহী ব্যক্তিকে কেবল ভক্তিতে নহে, জ্ঞানে, কেবল জ্ঞানে নহে, কর্ম্মে, হৃদয়ে মনে এবং চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে। অতএব সংসারের মধ্যে থাকিয়া আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্রহ্মের

সত্তা উপলব্ধি করিব, অন্তরাত্মার মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব করিব এবং আমাদের সমুদয় কর্ম্ম তাঁহার সম্মুখে কৃত এবং তাঁহার উদ্দেশে সমর্পিত হইবে।

কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে হইলে, চতুর্দ্দিকের জড়বস্তুরাশিকে অপসারিত করিয়া ব্রহ্মের মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণ আশ্রিত আবৃত নিমগ্ন অনুভব করিতে হইলে তাঁহাকে সাকাররূপে কল্পনাই করা যায় না। উপনিষদে আছে, যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই সমস্ত জগৎ সেই প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে। অনন্ত প্রাণের মধ্যে সমস্ত বিশ্বচরাচর অহর্নিশি স্পন্দমান রহিয়াছে এই ভাব কি আমরা কোন প্রকার হস্তপদবিশিষ্ট মূর্ত্তি দ্বারা কল্পনা করিতে পারি? অথচ যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি, এই যাহা কিছু জগৎ সমস্ত প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে একথা মনে উদয় হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৃণগুল্মলতা-পুষ্পপল্লব পশুপক্ষী মনুষ্য চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্র, জগতের প্রত্যেক কম্পমান অণু পরমাণু এক মহাপ্রাণের ঐক্যসমুদ্রে হিল্লোলিত দেখিতে পাই—এক মহাপ্রাণের অনন্ত-কম্পিত বীণাতন্ত্রী হইতে এই বিপুল বিচিত্র বিশ্ব-সঙ্গীত ঝঙ্কৃত শুনিতে পাই। অনন্তপ্রাণের সেই অনির্দ্দেশ্যতা অনির্ব্বচনীয়তাই আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সেই জগদ্ব্যাপী জগদতীত প্রাণকে কোন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ আকারের মধ্যে

কল্পনা করিতে গেলে তখন আর তাঁহাকে আমাদের নিঃশ্বাসের মধ্যে পাই না, আমাদের চক্ষের নিমেষের মধ্যে পাই না, আমাদের রক্তের উত্তপ্ত প্রবাহ, আমাদের সর্ব্বাঙ্গের বিচিত্র স্পর্শ, আমাদের দেহের প্রত্যেক স্পন্দিত কোষ, প্রত্যেক নিঃশ্বসিত রোমকূপের মধ্যে পাই না; আকৃতির কঠিন ব্যবধানে, মূর্ত্তির অলঙ্ঘনীয় অন্তরালে তিনি আমাদের নিকট হইতে আমাদের অন্তর হইতে দূরে বাহিরে গিয়া পড়েন। আমার অশরীরী অভাবনীয় প্রাণ আমার আদ্যোপান্তে অখণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, আমার পদাঙ্গুলির কোষাণুর সহিত আমার মস্তিষ্কের কোষাণুকে যোগযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে,—আবার আমার এই রহস্যময় প্রাণের মধ্যে সেই পরমপ্রাণ আমার শরীরকোষের প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত সুদূরতম নক্ষত্রবর্ত্তী বাষ্পাণুর প্রত্যেক আন্দোলনকে এক অনির্ব্বচনীয় ঐক্যে এক অপূর্ব্ব অপরিমেয় ছন্দোবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা অনুভব করিয়া এবং অনুভবের শেষ করিতে না পারিয়া কি আমাদের চিত্ত পুলকিত প্রসারিত হইয়া উঠে না? কোনও মূর্ত্তির কল্পনা কি ইহা অপেক্ষা সহজে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন, খণ্ডতার কারাপ্রাচীর হইতে মুক্তিদানে সহায়তা করিতে পারে, অনন্তের সহিত আমাদের এমন অন্তরতম ব্যাপকতম যোগ সংনিবদ্ধ করিতে পারে? সাকার মূর্ত্তি আমাদিগকে সহায়তা করে না, ব্রহ্মকে দূরে লইয়া দুষ্প্রাপ্য করিয়া দেয়।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যেহনাত্ম্যেহনিরুক্তেহনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোহভয়ংগতো ভবতি—

যখন সাধক সেই অদৃশ্যে, অশরীরে, নির্ব্বিশেষে, নিরাধারে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি—

কিন্তু যখন তিনি ইহাতে লেশমাত্র অন্তর অর্থাৎ দূরত্ব স্থাপন করেন তখন তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। সেই অদৃশ্যকে দৃশ্য, অশরীরকে শরীরী, নির্ব্বিশেষকে সবিশেষ এবং নিরাধারকে আধার-বিশিষ্ট করিলে ব্রহ্মের সহিত দূরত্ব স্থাপন করা হয় এবং তখন আমাদের আত্মার অভয় প্রতিষ্ঠা চূর্ণ হইয়া যায়।

উপনিষৎ বলিতেছেন—

অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

তিনি আছেন এই কথা যে বলে সে ছাড়া অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে কি করিয়া উপলব্ধি করিবে? তিনি আছেন ইহার অধিক আর কি বলিবার আছে? তিনি আছেন একথা যখনি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারি তখনই আমাদের মনোনেত্রের সম্মুখে অনন্ত শূন্য ওতপ্রোত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে—তখনি যথার্থতঃ বুঝিতে পারি যে, আমি আছি, বুঝিতে পারি যে, আমার বিনাশ

নাই, আত্ম ও পর জড় ও চেতন, দেশ ও কাল নিষ্কল পরমাত্মার দ্বারা এক মুহূর্ত্তেই অখণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; তখন আমাদের এই পুরাতন পৃথিবীর দিকে চাহিলে ইহাকে আর ধূলিপিণ্ড বলিয়া বোধ হয় না, নিশীথ নভোমণ্ডলের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিলে তাহারা শুদ্ধমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে প্রতীয়মান হয় না, তখন আমার অন্তরাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ধূলিকণা, এই ভূমিতল হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত একটি শব্দ ধ্বনিহীন গাম্ভীর্য্যে উদ্গীত হইয়া উঠে—ওঁ,—একটি বাক্য শুনিতে পাই—অস্তি, তিনি আছেন—এবং সেই একটি কথার মধ্যেই সমস্ত জগৎচরাচরের, সমস্ত কার্য্যকারণের সমস্ত অর্থ নিহিত পাওয়া যায়। সেই মহান্ অস্তি শব্দকে কোনও আকারের দ্বারা মূর্ত্তি দ্বারা সহজ করা যায় কি? এমন সহজ কথা কি আর কিছু আছে যে তিনি আছেন? আমি আছি এ কথা যেমন জগতের সকল কথার অপেক্ষা সহজ তিনি আছেন এ কথা না বলিলে আমি আছি এ কথা যে আদ্যোপান্ত নিরর্থক মিথ্যা হইয়া যায়। আমার অস্তিত্ব বলিতেছে, আমার আত্মা বলিতেছে তিনি আছেন, সাকার মূর্ত্তি কি তদপেক্ষা সহজ সাক্ষ্য আর কিছু দিতে পারে?

ব্রহ্মের সেই বিশুদ্ধ ভাব কিরূপে মনন করিতে হইবে?

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।

কি উর্দ্ধদেশ, কি তির্য্যক্, কি মধ্যদেশ কেহ ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে না—তাঁহার প্রতিমানাই,তাঁহার নাম মহদ্‌যশ!

প্রাচীন ভারতে সংসারবাসী জীবাত্মার লক্ষ্যস্থান এই পরমাত্মাকে বিদ্ধ করিবার মন্ত্র ছিল—ওঁ।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

তাঁহার প্রতিমা ছিল না, কোন মূর্ত্তিকল্পনা ছিল না—পূর্ব্বতন পিতামহগণ তাঁহাকে মনন করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটিমাত্র শব্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে শব্দ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি পরিপূর্ণ, কোন বিশেষ অর্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সেই শব্দ চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, কোন বিশেষ আকার দ্বারা বাধা দেয় না; সেই একটি মাত্র ওঁ শব্দের মহাসঙ্গীত জগৎসংসারের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে।

ব্রহ্মের বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য পিতামহগণ কিরূপ যত্নবান ছিলেন ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ হইবে।

চিন্তার যতপ্রকার চিহ্ন আছে তন্মধ্যে ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার অনুগামী। কিন্তু ভাষারও সীমা আছে, বিশেষ অর্থের দ্বারা সে আকারবদ্ধ—সুতরাং ভাষা আশ্রয় করিলে চিন্তাকে ভাষাগত অর্থের চারি প্রান্তের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়।

ওঁ একটি ধ্বনিমাত্র—তাহার কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। সেই ওঁ শব্দে ব্রহ্মের ধারণাকে কোন অংশেই সীমাবদ্ধ করে না—সাধনা দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে যতদূর জানিয়াছি

যেমন করিয়াই পাইয়াছি এই ওঁ শব্দে তাহা সমস্তই ব্যক্ত করে—এবং ব্যক্ত করিয়াও সেইখানেই রেখা টানিয়া দেয় না। সঙ্গীতের স্বর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ওঁ শব্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি আমাদের ব্রহ্মধ্যানের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয়তা অবতারণা করিয়া থাকে। বাহ্য প্রতিমা দ্বারা আমাদের মানস ভাবকে খর্ব্ব ও আবদ্ধ করে—কিন্তু এই ওঁ ধ্বনির দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

সেইজন্য উপনিষদ বলিয়াছেন—ওমিতি ব্রহ্ম। ওম্ বলিতে ব্রহ্ম বুঝায়। ওমিতীদং সর্ব্বং, এই যাহা কিছু সমস্তই ওঁ। ওঁ শব্দ সমস্তকেই সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অর্থবন্ধনহীন কেবল একটি সুগম্ভীর ধ্বনিরূপ ওঁ শব্দ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার ওঁ শব্দের একটি অর্থও আছে—সে অর্থ এত উদার যে তাহা মনকে আশ্রয় দান করে অথচ কোন সীমায় বদ্ধ করে না।

আধুনিক সমস্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্য ভাষায় যেখানে আমরা হাঁ বলিয়া থাকি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সেইখানে ওঁ শব্দের প্রয়োগ। হাঁ শব্দ ওঁ শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। উপনিষদও বলিতেছেন ওমিত্যেতদ্ অনুকৃতির্হস্ম—ওঁ শব্দ অনুকৃতিবাচক, অর্থাৎ ইহা কর বলিলে, ওঁ অর্থাৎ হাঁ বলিয়া সেই আদেশের অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ওঁ স্বীকারোক্তি।

এই স্বীকারোক্তি ওঁ, ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক শব্দরূপে গণ্য হই-য়াছে। ব্রহ্মধ্যানের কেবল এইটুকু মাত্র অবলম্বন—ওঁ, তিনি হাঁ। ইংরাজ মনীষী কার্লাইলও তাঁহাকে Everlasting Yay অর্থাৎ শাশ্বত ওঁ বলিয়াছেন। এমন প্রবল পরিপূর্ণ কথা আর কিছুই নাই, তিনি হাঁ, ব্রহ্ম ওঁ।

আমরা কে কাহাকে স্বীকার করি সেই বুঝিয়া আত্মার মহত্ত্ব। কেহ জগতের মধ্যে একমাত্র ধনকেই স্বীকার করে, কেহ মানকে, কেহ খ্যাতিকে। আদিম আর্য্যগণ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে ওঁ বলিয়া স্বীকার করিতেন, সেই দেবতার অস্তি-ত্বই তাঁহাদের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হইত। উপনিষদের ঋষিগণ বলিলেন জগতে ও জগতের বাহিরে ব্রহ্মই একমাত্র ওঁ তিনিই চিরন্তন হাঁ, তিনিই Everlasting Yay। আমাদের আত্মার মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশ-কালকে অতিক্রম করিয়া তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ। এই মহৎ নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী যে হাঁ, ওঁ ধ্বনি ইহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোন প্রতিমা ছিল না, কোন চিহ্ন ছিল না—কেবল এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল ওঁ। এই ধ্বনির সহায়ে ঋষিগণ উপাসনানিশিত আত্মাকে একাগ্রগামী শরের ন্যায় ব্রহ্মের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিতেন। এই ধ্বনির সহায়ে ব্রহ্মবাদী সংসারীগণ

বিশ্বজগতের যাহা কিছু সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা সমাবৃত করিয়া দেখিতেন।

ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ বলিয়া সাম সকল গীত হইয়া থাকে। ওঁ আনন্দধ্বনি।

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওঁ আদেশবাচক। ওঁ বলিয়া ঋত্বিক আজ্ঞা প্রদান করেন। সমস্ত সংসারের উপর আমাদের সমস্ত কর্ম্মের উপর মহৎ আদেশরূপে নিত্যকাল ওঁ ধ্বনিত হইতেছে। জগতের অভ্যন্তরে এবং জগৎকে অতিক্রম করিয়া যিনি সকল সত্যের পরম সত্য—আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি সকল আনন্দের পরমানন্দ, এবং আমাদের কর্ম্মসংসারে তিনি সকল আদেশের পরমাদেশ। তিনি ওঁ।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ,
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

তিনি যেখানে সেখানে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্র তারকের প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অগ্নির প্রকাশ কোথায়? সেই জ্যোতির্ম্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত দীপ্যমান। তিনিই ওঁ।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

এই যে অন্তরতর পরমাত্মা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতেই প্রিয়। তিনিই ওঁ।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং।
ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যং।
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং।

সত্য হইতে স্খলিত হইবে না, ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইবে না, কল্যাণ হইতে স্খলিত হইবে না, মহত্ত্ব হইতে স্খলিত হইবে না। ইহা যাঁহার অনুশাসন তিনিই ওঁ।

(অনেকে বলেন, দুর্ব্বল মানবপ্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার চরিতার্থতা আমরা ঈশ্বরে পাইতে চাই; আমাদের প্রেম কেবল জ্ঞানে ও ধ্যানে পরিতৃপ্ত হয় না, সেবা করিতে চায়; আমাদের প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ঈশ্বরকে মূর্ত্তিতে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অশন বসন ভূষণ উপহারে পূজা করিয়া থাকি।)

(এ কথা সত্য যে, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা মানব প্রকৃতির চরম চরিতার্থতা অন্বেষণ করি; কেবল ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা সেই চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে না, সেই জন্যই শাস্ত্রে গৃহস্থকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে বলিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছেন, গৃহী যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মকে সমর্পণ করিবেন। সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যপালনই ব্রহ্মের সেবা। যদি প্রতিমাকে অন্নবস্ত্র পুষ্পচন্দন দান করিয়া

আমরা দেবসেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করি তবে তাহাতে আমাদের কর্ম্মের মহত্ত্ব লাভ না হইয়া ঠিক তাহার বিপরীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদিগকে সকল জ্ঞানের চরিতার্থতার দিকে লইয়া যায়, ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি আমাদিগকে পুত্র-প্রীতি ও অন্য সকল প্রীতির পরম পরিতৃপ্তিতে লইয়া যায়, এবং ব্রহ্মের কর্ম্মও সেইরূপ আমাদের শুভ চেষ্টাকে চরম মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের অভিমুখে আকর্ষণ করে। আমাদের জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের এইরূপ মহত্ত্ব সাধনের জন্যই মনু গৃহীকে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। মানবপ্রকৃতির যথার্থ চরিতার্থতা তাহাতেই ভোগে নহে, খেলায় নহে। প্রতিমাকে স্নান করাইয়া বস্ত্র পরাইয়া অন্ন নিবেদন করিয়া, আমাদের কর্ম্ম-চেষ্টার কোন মহৎ পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না, তাহাতে আমাদের কর্ত্তব্যের আদর্শকে তুচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ করিয়া আনে। ভক্তি ও প্রীতির উদারতা অনুসারে কর্ম্মেরও উদারতা ঘটিয়া থাকে। পরিবারের প্রতি যাহার যে পরিমাণে প্রীতি সে পরিবারের জন্য সেই পরিমাণে প্রাণ পাত করিয়া থাকে। দেশের প্রতি যাহার ভক্তি, দেশের সর্ব্বপ্রকার দৈন্য ও কলঙ্ক মোচনের জন্য বিবিধ দুরূহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া সে আপন ভক্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতা সাধন করিয়া থাকে। ব্রহ্মের প্রতি যাহার গভীর নিষ্ঠা, সে, পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দেশের প্রতি, সকলের প্রতি মঙ্গল-চেষ্টা নিয়োগ করিয়া ভক্তিবৃত্তিকে

সফলতা দান করে। দীনকে বস্ত্রদান, ক্ষুধিতকে অন্নদান ইহাতেই আমাদের সেবাচেষ্টার সার্থকতা। প্রতিমার সম্মুখে অন্ন বস্ত্র উপহরণ করা ক্রীড়ামাত্র, তাহা কর্ম্ম নহে, তাহা ভক্তিবৃত্তির মোহাচ্ছন্ন বিলাসমাত্র, তাহা ভক্তিবৃত্তির সচেষ্ট সাধনা নহে। এই খেলায় যদি আমাদের মুগ্ধ হৃদয়ের কোন সুখ সাধন হয় তবে সেত আমাদের আত্মসুখ, আমাদের আত্ম-সেবা, তাহাতে দেবতার কর্ম্মসাধন হয় না। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম নিজের সুখের জন্য না করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে করা এবং তাহাতেই সুখানুভব করা দেবসেবার উচ্চ আদর্শ। সেই আদর্শকে রক্ষা করিতে হইলে জড় আদর্শকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সত্যজ্ঞান দুরূহ, প্রকৃত নিষ্ঠা দুরূহ, মহৎ কর্ম্মানুষ্ঠান দুরূহ সন্দেহ নাই, তাই বলিয়া তাহাকে লঘু করিয়া, ব্যর্থ করিয়া, মিথ্যা করিয়া, মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া আমরা কি ফল লাভ করিয়াছি? কর্ত্তব্যকে খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মকে, মানব প্রকৃতির সর্ব্বোচ্চ শিখরকে কয়েক খণ্ড মৃৎপিণ্ডে পরিণত করিয়া খেলা করিতে করিতে আমরা কোন্‌খানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি! আমরা নিজেকে অক্ষম অশক্ত নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্ট জড়ত্বকে আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা অকুণ্ঠিত স্বরে নিজেকে আধ্যাত্মিক

শিশু বলিয়া প্রচার করি, এবং সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যোচিত কঠিন সাধনা ও মহৎপ্রয়াস হইতে নিষ্কৃতি, জ্ঞানীর নিকট হইতে মার্জ্জনা ও ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রশ্রয় প্রত্যাশা পূর্ব্বক নিদ্রা, ক্রীড়া ও উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার দ্বারা সুখলালিত হইয়া নিস্তেজ নির্ব্বীর্য্য হইতে থাকি; যুক্তিকে পঙ্গু করিয়া, ভক্তিকে অন্ধ করিয়া, আত্মপ্রত্যয়কে আচ্ছন্ন করিয়া, ব্রহ্মকে চিন্তা ও চেষ্টা হইতে দূরীভূত করিয়া, হৃদয় মন আত্মার মধ্যে আলস্য এবং পরাধীনতার সহস্রবিধ বীজ বপন করিয়া আমরা জাতীয় দুর্গতির শেষ সোপানে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছি। অদ্য আমরা ভয়ে ভীত, দীনতায় অবনত, শোক তাপে জর্জ্জর। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত, হীনবল। আমাদের বাহিরে লাঞ্ছনা, অন্তরে গ্লানি, চতুর্দ্দিকেই জীর্ণতা। আমাদের বাহিরে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যেরূপ বিচ্ছেদ, আমাদের নিজের প্রকৃতির মধ্যে আমাদের "চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াং" মনে বাক্যে ও কর্ম্মে বিরোধ, শিক্ষায় ও আচরণে বিরোধ, ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে ঐক্য নাই—সেই কাপুরুষতায় এবং বিচ্ছিন্নতায় আমাদের সমাজ আমাদের গৃহ আমাদের অন্তঃকরণ অসত্যে আদ্যোপান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছে। আমাদিগকে এক হইতে হইবে, সতেজ হইতে হইবে, ভয়হীন হইতে হইবে। অজ্ঞান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইব। কে আমাদের বল, কে আমাদের আশ্রয়? সে কোন্

সর্ব্বব্যাপী সত্য, কোন্ অদ্বিতীয় এক, যিনি আমাদিগকে জাতিতে জাতিতে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনে বাক্যে ও কর্ম্মে একতা দান করিবেন? সংসারের মধ্যে আমরা লোকভয়-মৃত্যুভয়জয়ী পরম নির্ভর পাই নাই; সংসার গুরুভার লৌহ-শৃঙ্খলে আমাদের অবমানিত মস্তককে আরও অবনত করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের জড় দুর্ব্বল দেহকে আরও গতিশক্তিবিহীন করিয়াছে। এই সকল ভয় এবং ভার এবং ক্ষুদ্রতা হইতে ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র মুক্তি। দিনে রাত্রে সুপ্তিতে জাগরণে অন্তরে বাহিরে আমরা তাঁহার মধ্যে আবৃত নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছি—কোন প্রবল রাজা, কোন পরম শত্রু কোন প্রচণ্ড উপদ্রবে তাঁহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। অদ্য আমরা সমস্ত ভীত ধিক্কৃত ভারতবর্ষ কি এক হইয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে বলিতে পারি না যে,—

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

তুমি অজাত, জন্মরহিত, কোন ভীরু তোমার শরণাপন্ন হইতেছে, হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। তিনি রহিয়াছেন—ভয় নাই, ভয় নাই! সম্মুখে যদি অজ্ঞান থাকে তবে দূর কর, অন্যায় থাকে তবে আক্রমণ কর, অন্ধ সংস্কার বাধাস্বরূপ থাকে তবে তাহা সবলে ভগ্ন করিয়া ফেল; কেবল তাঁহার

মুখের দিকে চাও এবং তাঁহার কর্ম্ম কর। তাহাতে যদি কেহ অপবাদ দেয় তবে সে অপবাদ ললাটের তিলক করিয়া লও; যদি দুঃখ ঘটে সে দুঃখ মুকুটরূপে শিরোধার্য্য করিয়া লও; যদি মৃত্যু আসন্ন হয় তবে তাহাকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ কর। অক্ষয় আশায়, অক্ষুণ্ণ বলে, অনন্ত প্রাণের আশ্বাসে, ব্রহ্ম-সেবার পরম গৌরবে সংসারের সঙ্কট পথে সরল হৃদয়ে ঋজু দেহে চলিয়া যাও। সুখের সময় বল, অস্তি—তিনি আছেন, দুঃখের সময় বল, অস্তি—তিনি আছেন, বিপদের সময় বল, অস্তি—তিনি আছেন। পরমাত্মার মধ্যে আত্মার অবাধ স্বাধীনতা, অপরিসীম আনন্দ, অপরাজিত অভয় লাভ করিয়া সমস্ত অপমান দৈন্য গ্লানি নিঃশেষে প্রক্ষালিত করিয়া ফেল। বল, যে মহান্ অজ আত্মা হইতে বাক্য মন নিবৃত্ত হইয়া আসে আমি সেইখান হইতে আনন্দ লাভ করিয়াছি, আমি কদাচ ভয় করি না, আমি কাহা হইতেও ভয় পাই না—আমার ন জরা, ন মৃত্যু শোকঃ। বল—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমথো
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং।
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মামা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ
অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেঽস্তু।
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ
তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥

উপনিষৎ-কথিত সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্রহ্ম আমার বাক্য প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বল ইন্দ্রিয়, আমার সমুদয় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুনন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি, তিনি অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা-কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন্। সেই পরমাত্মায় নিরত আমাতে উপনিষদের যে সকল ধর্ম্ম তাহাই হৌক্, আমাতে তাহাই হৌক্!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।
